রাসমণির কাহিনী

বাণী রায়

রাসমণির কাহিনী

বাণী রায়

আঠারো নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে যখন ছিলাম একবার যে সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলাম, সে কথাই তোমাদের শোনাব।

আমরা পূর্ববঙ্গের ছোটোখাটো জমিদার। দেশে পালাপার্বণ সবই হয় । তবে, আমাদের ভাই বোনদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্যে বাবা মা কলকাতায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে বারোমাস থাকে। আমরা স্কুলের গণ্ডি পার হলে যে যার মতো হষ্টেলে থাকব, ও'রা দেশে চলে যাবেন। কিংবা আমরা সবাই বাড়ি করে একসঙ্গে থাকব ঝি চাকর নিয়ে। ওঁদের আর আগলাতে হবে না। পাড়াগাঁয়ে বাড়ি যাদের, তারা তো একঘেয়ে শহরে পড়ে থাকতে পারে না।

দেশের বিষয়সম্পত্তির তদারকে ছিলেন আমার কাকা-কাকিমা। ও'দের বড়ো বড়ো ছেলেপিলে, যারা গ্রামের স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে, তারাও কলকাতায় থাকত। সব ভাই বোনদের মধ্যে বড়ো ছিলাম আমি। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পা দিয়েছি। বড়দি আমি সবাইকার। দু জায়গায় সংসার হওয়ায় মাঝে মাঝে বাবা মাকে বিব্রত হয়ে পড়তে হত। সেবার গরমের ছুটির মাসখানেক আগে একটা গোলমাল বেঁধে গেল।

দেশ থেকে আমার বাবার নামে তার এল যে কাকা হঠাৎ টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছে । গাঁয়ের ডাক্তারেরা হালে পানি পাচ্ছেন না। বাবা যেন এক্ষুনি ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন। কাকাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে হবে কি না সেটাও বাবার দেখা দরকার।

বাবার একটি মাত্র ছোট ভাই খুব আদরের। অজপাড়া গাঁয়ে চিকিৎসাপত্রের ভালো ব্যবস্থা নেই। বাবা সকালে তার পরেই বিকালের গাড়িতে দেশে যাওয়া ঠিক করে ফেললেন ।

মা বললেন, “আমিও যাই তোমার সঙ্গে । অত বড়ো রুগী পড়ে । ছোটো বউ একা কি রোগীর সেবা, ঘরকন্না, ছোটো ছেলেপিলে নিয়ে চালাতে পারে!”

বাবা বাধা দিলেন, “না, সে কী করে হবে? এরা সবাই একা একা কী করে থাকবে কলকাতায়? স্কুল-কলেজ বন্ধের দেরি আছে। রুবির কলেজ খোলা। এদের খাওয়াদাওয়া দেখবে কে ? সংসার চালাবে কে ?"

মা ব্যাকূল হয়ে বললেন, “ সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। একটি ভালো দেখে পোক্ত ঝি রেখে যাচ্ছি। ঘর সংসার সেই দেখবে। পুরোনো দরোয়ান কানাই সিং রইল। ঠাকুর চাকর আছে কোনো অসুবিধা হবে না। কদিন পরেই তো ওদের স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে।”

বাবা ইতস্তত করতে লাগলেন, “ দেখো, বিদেশ বিভূঁই, রুবির বয়স কম। ওর দায়িত্বে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া কি ভালো হবে? আর এক্ষুনি ভালো বিশ্বাসী ঝি তুমি পাবে কোথায় ?

কলকাতা ভীষণ জায়গা। এখানের ঝিরাও ভালো হয় না, জান তো ?” মা বললেন, “তুমি আজ চলে যাও, আমি কালকের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে, ঝি রেখে সরকারমশাইকে নিয়ে রওনা হব।”

বাবা বললেন, “সরকারমশাইকেও নিয়ে যাবে? তাহলে এরা থাকবে কী করে? ও'র যথেষ্ট বূদ্ধিসুদ্ধি আছে। ও'র হাতে এদের রাখা চলত । নাহ্, তোমার যাওয়া হয় না ।”

মা কেঁদে বলতে লাগলেন, ‘ ‘তুমি অমত কোরো না। ছোটো তো শুধু তোমার ভাই নয়, আমিও তো ওকে হাতে করে মানুষ করেছি। ওর অসুখ শুনলে আমার কেমন লাগে ? সরকারমশাই আমাকে পৌছেই ফিরে আসবেন। তুমি আর অমত কোরো না।”

বাবা বাধ্য হয়ে চুপ করলেন ।

বাবা চলে গেলেন বিকালবেলার গাড়িতে। সন্ধ্যার মুখে চাকর রামনিধিয়া একটি ঝি নিয়ে

এল। আধাবয়সি, রং ময়লা, মুখ ঢাকা ঘোমটায়। জড়সড় ভাবে দাঁড়িয়ে রইল দালানের থামের আড়ালে।

আমি নীচে নামছিলাম তখন। হঠাৎ ঝিয়ের দিকে নজর পড়ামাত্র আবছা আলোয় ওর আবছা মূর্তি দেখে কেমন এক অজানা অস্বস্তিতে মনটা ভরে উঠল। কেন জানি না। ভাবলাম, কাকার অসুখ, মা বাবা চলে যাচ্ছেন, তাই মনটা খারাপ হয়েছে।

আমাকে দেখামাত্র ঝিটা যেন কেমন করে গা দুলিয়ে সরে এল পায়ে পায়ে আমার দিকে । ওর বচনচ্ছটা ও রামনিধিয়ার ওকালতিতে তখন আমার ভালোমানুষ মা ওকে কাজে বহাল করে ফেলেছেন।

মা আমাকে দেখিয়ে বললেন, “এই যে বড়ো দিদিমণি রুবি, বাড়ির গিন্নি এখন। রাসমণি, তুমি দিদিমনির কথা শুনে চলবে । সর্বদা দিদিমণির দিকে চোখ রাখবে ।”

ঝিটা আবার অদ্ভুত ধরনের গা দুলিয়ে মাথা হেলাল। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, “অমন মুখ ঢেকে আছ কেন ? মুখ খোলো না!"

মাও বললেন, "হ্যা বাছা। মাথার কাপড় তোলো না।” ইনিয়েবিনিয়ে ঝিটা “বলল, “বড়ো লজ্জা লাগে, মা।”
কিন্তু মুখ সে খুলল। সাধারণ রোগা কালো চেহারা । মুখের হাঁ টা কিন্তু বেখাপ্পা মতো। ঠোঁট দুটো যেন কে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে তুলে সরু চোঙার মতো করে রেখেছে । মুখ যেন নয়, একটি চোঙা। সে ঠোঁট আবার টকটকে লাল, বোধহয় পান জরদা খাবার দারুণ নেশা আছে। এক জোড়া জোঁক যেন রক্ত শুষে লাল হয়ে আছে । সেদিন ঝিটাকে দেশে এত কথাই অকারণে আমার মনে হয়েছিল।

রাসমণি ঝি বহাল হল গোটা একটা দিন যা তাকে দেখে বিকালের গাড়িতে দেশে চলে গেলেন। কাজকর্মে ঝি খুব পটু, আচার ব্যবহারে বিনয় আছে । আজকালকার বাজারে এমন ঝি পাওয়া ভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু, হায়, তখন কে জানত ভাগ্যের চক্রান্ত।

মা যাবার আগে আমাকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিলেন । উড়ে চাকর রামনিধিয়া বিশ্বাসী হলেও কানাই সিং পুরনো লোক। তার হাতে আমাদের সবাইকে রেখে মা রওনা হয়ে গেলেন। অবশ্য ঠিক রইল, আমার মেসোমশাই রোজ রাতটা এখানে কাটিয়ে যাবেন। কাল সরকারমশাই ফিরে আসবেন। তাড়াতাড়ি হলেও পাকাপাকি ব্যবস্থা না করে মা নিশ্চিত হলেন না। আড়ালে মা বললেন, “ দেখ রুবি, নতুন লোক রেখে গেলাম রাসমণিকে। মেয়ে না হলে সংসার চলে না। ওর দিকে চোখ রাখিস কিন্তু। ”

আমি পাকা গিন্নির মতো ঘাড় দুলিয়ে আশ্বাস দিলাম, “তোমরা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? দেখেশুনে সংসার চালিয়ে নেব আমি। ভারী তো কটা দিন থাকবে না!”

“আমি তোর কাকাকে একটু ভালো দেখলেই চলে আসব । একটা দিন রাসমনি না হয় তোর ঘরের মেঝেতে শোবে।" “নূতন লোককে শূইয়ে দরকার কী, মা ?" আমার কথায় মা জিভ কেটে বললেন, “নারে ও তেমন নয়, ভদ্রঘরের মানুষ। আমাকে বলেছে যেখানে যেখানে আমরা কাজ নিই না, মা। যেখানে পোষায় সেখানেই নিই।"

আমার মনের মধ্যে কেমন করে উঠল আবার। ‘পোষানো' মানেটা কী? কেন বেছে বেছে আমাদের বাড়ি এল ও ? আকাশে একটা ঝোড়ো বাতাস খেলে গেল হঠাৎ। চৈত্র মাসের কালবৈশাখি । মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, “তাহলে স্টেশনে যাওয়াই ভালো। ঝড় উঠে আসছে।” তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে মা বললেন, “রাসমণির সবই ভালো, কিন্তু একটা কী ধরন আছে যেন। একদিনে বুঝলাম না ঠিক । একটু লোভী ধরন । খাওয়দাওয়ার দিকে লোভ আছে

সাবধানে থাকিস, রুবি।"

মা গাড়িতে উঠে গেলেও আমি চাতালে অনেকক্ষন ধরে একা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চারপাশে সন্ধ্যার অন্ধকার। মন খারাপ । মা যেন আমাকে অথৈ জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেলেন ।

নিজেকে সামলে নিয়ে দাোতলায় উঠবার উপক্রম করতেই দেখলাম, সিঁড়ির আড়ালে কে যেন চট করে সরে গেল। লক্ষ করে দেখলাম নূতন ঝি রাসমণি। স্পষ্ট বোঝা গেল ও মায়ের সঙ্গে আমার কথাগুলো গা ঢাকা দিয়ে শূনেছে। কী স্পর্ধা ওর । রুক্ষ গলায় বললাম, ' 'তুমি ওখানে কী করছ চুপিচুপি দাঁড়িয়ে ?" সিঁড়ির আড়াল থেকে রাসমণি আলোতে চলে এল। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও। বিরক্ত হয়ে বললাম, "হা করে আমাকে কী দেখছ?" সে তক্ষুনি মাথা নামিয়ে নিল, ঠোটের উপর দিয়ে জিবটা বূলিয়ে চাপা সুরে উত্তর দিল, "রাগ করবেন না, দিদিমণি। আপনারে দ্যাখতে আমার ভালো লাগে ।" সঙ্গে সঙ্গে চাকরদের ঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

খুশি হলাম । ঝিটার মনে ভয় ভয় আছে। আমার ধমকে ভয় পেয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল তাই। বাঙাল দেশের লোক, পাকিস্তানি ব্যাপারে পরের বাড়ি এসে পড়েছে। না, লোকটা নম্র আছে। তবে, কেন জানি না ও বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন খারাপ হয়ে উঠেছে। ওকে লক্ষ রাখতে হবে।

কেটে গেল রাত। দেশে কিন্তু অবস্থা সুবিধার হল না। কাকার অসুখ এত বেড়ে গেল যে সরকারমশাই পর্যন্ত আটকে গেলেন। তবু আমরা আশা করতে লাগলাম যে কোনোদিন মাকে নিয়ে হয়তো চলে আসবেন উনি।

দিন দুই পরে কানাই সিং এসে আমাকে বলল, "হামি ওই লতূন ঝিটারে পছন্দ করি না,

দিদিমণি। ও আচ্ছা শয়তান আছে । রাত দোপহরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল কাল। হামি ভাবলাম, ও বুঝি চাোরের দলের আদমি আছে, দলকে ডাকতে গেল তাই হামি ওর পিছনে পিছনে গেলাম । যেয়ে দেখি রামো, রামো।" কানাই সিং ঘেন্নায় নাকমুখ শিটকে বললে, "দেখলাম ও পাড়ার ডাস্টবিনের সামনে ময়লার মধ্যে বসে পড়ল একটো মরা কুকূরের সামনে । হামার আর সহ্যি হোল না। হামি ওকে বললাম , 'কেমন আওরত তুমি। ভদ্দর আদমির বাড়ি কাম করছো তা এমন ময়লার মধ্যে কেন ? ও হামাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিল। হামার মালুম হয় ও চোরের লোক আছে। হামি পেছু আসছি টের পাইয়ে ডাস্টবিনের সামনে বসে পড়লো। ওকে তাড়ই দিন, দিদিমণি।"

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "মা রেখে গেছেন ওকে ... তিনি না ফিরে এলে আমি তো তাড়াতে পারিনে । বিনা দোষে তাড়াবই বা কেন ? ডাস্টবিনের সামনে যেয়ে বসে থাকাটা ঘেন্নার কথা হলেও, দোষ বলে শাস্তি দেওয়া চলে না।"

কানাই সিং উত্তেজিত হয়ে বলল, "হামি বলছি ও লোক ভালো না। কেমন চাউনি ওর, দেখেন না ?" আমি বললাম, ' রামনিধিয়া কি চোর বা খারাপ লোক দেবে ? ওই তো এনেছে রাসমণিকে।"

কানাই সিং চটে উঠল, "ও বুড়ার কথা ছাড়িয়া দেন। ও তো চব্বিশ ঘণ্টাভর পানের দোকানে আছে। যে উনকো পান জরদা খিলাবে ও তারই তারিফ করবে ।"

আমি রামনিধিয়াকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম। রামনিধিয়া হাউমাউ করে যা বলল তার মর্ম হচ্ছে যে, প্রায় একবছর হল রামনিধিয়া রাসমণিকে চেনে । পাড়রে পানের দোকানে যাতায়াত ছিল রাসমণির । ভদ্রঘরের বউ, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে পেটের দায়ে লোকের বাড়ি ঝি বৃত্তি করছে। কিন্তু কোথাও টিকতে পারেনি বেচারি। তবে, যেখানেই যাক ওই পানের দোকানের পাতার গুড়াে রাসমণির চাই। পান না খেলেও পানের দোকানের

নেশা আছে ওর। অবাক হয়ে ভাবলাম পান খায় না, তবু ঠোঁট তো লালে লাল। উড়ে চাকর রামনিধিয়া পানের দোকানের বাঁধা খদ্দের । সেই দোকানের যোগাযোগে রাসমণি এসেছে। রামনিধিয়া বললেন, “দিদিমণি, ম কি মিছা বলিব ? রাসমণি বড়া ভালা মনিষ আছে। এক পয়সা ছোঁয় না মনিবের। ম কে কতো আবার পান খাওয়ায়। এই দারোয়ানজিকে দিয়ে ব্রেত করাবে বলছে।"

কানাই সিং নরম হয়ে বললে, “তবে, হামি একটা বাত তোমাকে জিগাই । ও তো ভালা আওরাত আছে, তবে বেলা ও রাতমে মরা কুকুরকা পাশ গিয়াছিল?"

আমার মনের মধ্যের অস্বস্তি আবার মাথা তুলল, “ঠিক কথা বলেছে কানাই সিং। রাসমণিকে ডাকো! তো ।’ ’

আধঘোমটা মাথায় রাসমণি আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল। আমাদের অভিযোগ শূনে সে খানিকক্ষণ উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি আবার বিরক্ত হলাম । হলই বা পাড়া গাঁয়ে মানুষ । ঝি সর্বদা মনিবের দিকে চেয়ে থাকবে কেন ? ধমক দিয়ে বললাম, ‘ ‘রাত বিরেতে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও কেন? মরা কুকুরের কাছে বসবার কী আছে? জ্যান্ত মানুষ বুঝি ভালো লাগে না ?”

আমার কথা শূনে কানাই সিং হোহো করে হেসে উঠল। রামনিধিয়া তার আনা মানুষের বিরুদ্ধে হাসতে না পেরে মাথা নামিয়ে রইল ।

রাসমণি কেমন বাঁকানো ভাবে আমার দিকে চেয়ে, কেমন বাকানো গলায় বলল, ‘ ‘না, দিদিমণি, জ্যান্ত মানুষ থাকতি মরা কুকুর লয়ে কী করব ? তবে, ও কুকুর আমার হাতে মানুষ। আমার মনিববাড়ির কুকুর,রামনিধিয়ারে পুছেন না?” রামনিধিয়া জানাল যে, সত্যিই রাসমণির আগের মনিবের কুকুর কাল মারা গেছে। ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। রাসমণি

হঠাৎ চোখে আঁচল দিয়ে ডুকরে উঠল, “ওই কুকুরডারে লয়ে দিনরাত থাকতাম বইল্যা আমারে ছাড্যায়ে দিল। সেই কুকুরটিরে চোখের দেখা দেখৰার গিছিলাম দিদিমণি, রাত্তিরের আধারে লুক্যায়ে।”

রাসমণির কোমল মনের মায়া মমতার পরিচয় পেয়ে আমি গলে গেলাম। সকলের চোখে রাসমণি বেশ অনেকটা উঁচুতে উঠে গেল।
ধীরে ধীরে রাসমণির গুণপনা দেখতে লাগলাম । কোনো সময় বসে না ও। ঘরদোর আপনা থেকে ঝেড়েমুছে ঝকঝকে করে রাখে। অন্যলোকের কাজ আগেভাগে সারে। মা ওকে লোভী সন্দেহ করেছিলেন। সে দিকে চোখ রেখেওও আশ্চর্য হলাম। খাবার বিষয়ে কোনো লোভ নেই। অর্ধেক জিনিস খায় না। ভাল ভাত চারটি নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়, আড়ালে বসে পাঁচ মিনিটে খাওয়া সারে । লোকের সামনে বসে খেতে হলে নেহাত দায়সারা গোছের বা না খেলে নয়, খেয়ে উঠে যায় । না খাওয়ারও সীমা আছে। একদিন বললাম, “এত বড়ো মানুষ, এত কম খেয়ে দিনরাত খাটো কী করে ?” রাসমণি আমার জুতো রং করছিল, মুখ তুলে বললে, “সবাই কি সব খ্যাতে পারে, দিদিমণি? যার যা ভালো লাগে, সে তাই খায় ?" কিন্তু দেখলাম যে না খেয়ে খেয়ে রাসমণি রোগা হয়ে গেছে । অমন টকটকে যে ঠোঁট সেও সাদা হয়ে উঠেছে ।

আমাকে রাসমণি অসম্ভব যত্ন করতে লাগল। মা বাবা কাছে না থাকার দুঃখ আমি ভুলে গেলাম । সব ভাই-বোনকেই যত্ন করত ও, কিন্তু আমাকে যেন প্রাণ ঢেলে করত। আমার জামাকাপড়, জুতো বই হাতের কাছে রাখা, আমার সুখ-সুৰিধার দিকে সবসময় নজর রাখা, এসব কথা আজও মনে হলে ভাবি নিজের মাও বোধহয় ছেলেমেয়েকে এত যত্ন করতে পারে না। জঘন্য উদ্দেশ্যে করলেও রাসমণির মতো যত্ন আমার জীবনে কেউ করেনি। বিশেষ করে, রাসমণি আমাকে ভালোমন্দ খাওয়াতে প্রাণ দিত। দিব্যি গোলগাল মানুষটি ছিলাম। রাসমণির যত্নে রীতিমতো মোটা হয়ে উঠলাম। তবু খাওয়ানোর বিরতি ছিল না ওর। এক বাতিক ছিল রাসমণির। যখন তখন বাটি বাটি দুধ এনে আমাকে পেড়াপিড়ি করত, “দুধ

টুকু খায়া ফ্যালান, দিদিমণি । গ্যায় রক্ত হবে।”

আমি দুধ খেতে ভালোবাসি না। বিরক্ত হয়ে বলতাম, ‘আমার রক্ত হলে তোমার কী ?” অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে ডাকাত । বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠত আমার। পরক্ষণেই মায়া জড়ানো সুরে চোখ নামিয়ে বলত, “আপনার মা আপনারে আমার হাতে দিয়া গ্যাছেন না ?” তা রাসমণি ভালোভাবেই আমার প্রতি চোখ রেখেছিল। সে ইতিহাস পরে শুনো।

ক্রমে ক্রমে রাসমণি বাড়ির প্রিয় হয়ে উঠল। বিশেষ করে আমি ওর ওপরে নির্ভর করতে লাগলাম। চোখের চাউনি অদ্ভুত হলেও রোগা কালো মানুষটার ঠোঁট ছাড়া কোনো বিশেষত্ব ছিল না। গালটা একটু ভাঙা, পুরুষালি গড়ন। ওকে দেখে প্রথম দিনের অজানা অস্বস্তি চলে গেল আমার। আমাকে ও এত ভালোবাসল যে আমারও ওর ওপরে কোনো সন্দেহ রইল না। ওর নির্লোভ স্বভাব আরও আমাকে অবাক করল । সোনাদানা, টাকা ছড়ানো থাকলেও ফিরে চাইত না ও। নিজের সামান্য টাকাকড়ি পর্যন্ত বাড়ির অন্য ঝি চাকরদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। ফলে, বেশ প্রতিষ্ঠা পেল ও। মনে মনে খুশি হয়ে ভাবলাম মা ফিরে এসে রাসমণিকে কত ভালো বলবেন।

এর মধ্যে মায়ের চিঠি এল, "তোমার কাকা ভালোর দিকে,কিন্তু কাকিমার আবার ওই অসুখ করেছে । এ সময়ে আমার যাওয়া সম্ভব নয়। তোমার বাবার কথা তো ওঠেই না। তবে খাজনা আদায়ের কাজটা মিটে গেলেই সরকারমশাইকে পাঠাব। তুমি ভালো সংসার চালাচ্ছ জেনে আমি তাড়াতাড়ি করছি না ফিরে যাবার । রাসমণি এত ভালো শুনে সুখী হলাম। রুবি মা, তুমি আর একটু ধৈর্য ধরে থাকো। তোমাদের ছুটির দেরি নেই। তখন একটা ব্যবস্থা হবে। তোমার মেসোমশায় তো দেখছেন তোমাদের ।

মেসোমশারের ওপর মায়ের মস্ত নির্ভর ছিল।কিন্তু মেসোমশায় রাত্রে সারাদিনের কাজের পরে ক্লান্ত শরীরে এসে শুতেন মাত্র একবার আমাকে ডাক দিয়ে। আবার ভোর হতে না

হতে মেসে চলে যেতেন। যাই হোক, দেখার লোকের অভাব ছিল না। রাসমণি একাই একশো, এর মধ্যে বিপদ হল। কানাই সিং দারোয়ান কোথা থেকে জলবসন্ত নিয়ে এল। নিজেও খুব ভুগল, আমার ছোটো ভাই সুশান্ত রও ছোঁয়াচ লেগে অসুখ হল।

বিপদে পড়লাম। রাসমণি আমাকে বোঝাল, “সামান্যি রোগ দিদিমণি। আমিই তো আছি। সেবাযত্নের ঘাটতি হবে না। খামোকা মা ঠানরে চিঠি লেখবেন না, ওনার পরানডা পুড়তি থাকবে।”

রাসমণি নিজগুণে বাড়ির কত্রী হয়েছে। ডাক্তারবাবুও ভরসা দিলেন। মাকে আসবার কথা লেখা হল না। রাত্রে সুশান্তের ঘরে আমি শুতে চাইলে রাসমণি আমাকে বোঝাল, “ছোঁয়াচে রোগের ঘরে থাকবেন ক্যান আপনি ? নিজের ঘরে শুয়্যা থাক্যে গা, আমি রাত জ্যাইগা দাদাবাবূরে পাহারা দেবনে। দরজাডা শুধু খুল্যা রাখবেন ঘরের। রাতবিরেতে ডাক দিতে হয় যদি।”

সেই ব্যাবস্থাই হল। রাসমণি নীচের ঘর থেকে ওপরে এসে সুশান্তর ঘরের মেঝেতে শুল, আমি আমার ঘরের দোর খুলে রাখলাম। রাত্রে কিন্তু রাসমণি ডাকল না।

সকালে উঠে দেখি মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করছে। ভয় হল। ছোঁয়াচে ব্যধি ঢুকেছে বাড়িতে, হয়তো আমারও হবে। কিংবা ভোরের ঠান্ডা বাতাস মাথার লেগে মাথা ধরেছে। সারাদিনটা শরীর বড়ো দুর্বল লাগল। সুশান্তর জন্য ব্যস্ত থাকায় নিজের দুর্বলতা আমল দিল না।

পরের দিন কিন্তু মাথা আরও ধরল ও শরীর বেশি ঝিমঝিম করতে লাগল। রাসমণিকে রলাতে সে একবাটি দুধ এনে ধরল মুখের কাছে। ঠিক করলাম আজ মাথার কাছের দোর বন্ধ করে শোব, হয়তো ভোরের ঠান্ডা বাতাস সোজা মাথায় লেগে এমনটা হচ্ছে।

রাত্রে ঘরের দোর দিতে গেলেই রাসমণি ছুটে এল, “ওকী দিদিমণি, দুয়্যার দ্যান ক্যান ? বোগী মানষের বাড়ি, দুয়্যার খোলা রাখন ভালো ।”

রাসমণি দরজার গোড়ার দাঁড়াল । সারাদিন রোগীর সেবা নিয়ে থাকলেও চেহারা এ কদিন ফিরছে ওর । ঠোট দুটার সাদাটে ভাবও কেটে গেছে । বললাম “দরজা দিচ্ছি তাতে কী? দরজা ঠেলে ডেকো ।” রসমণি কেমন ছটফট করতে লাগল, কী যেন চায় ও বলতে। এই ভাবটা মাঝে মাঝে দেখি ওর। অনেকদিন পরে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব এল, যেমন রাসমণিকে দেখে গোড়ার হয়েছিল। মনে হতে লাগল এ বাড়িতে রাসমণি থাকলে যেন অমঙ্গল হবে। রাসমণি যেন অন্য ধরনের লোক, কোথা যেন তফাত আছে ওর আমাদের সঙ্গে।

মনকে তখনই ঠিক করে ফেললাম। অসহায় গরিব মানুষ পেটের দায়ে খেটে খাচ্ছে।

প্রাণ দিয়ে ও আমাদের সেবা করে। সুশান্তর এমন ছোঁয়াচে ব্যধি, তাও ভ্রুক্ষেপ নেই। পুরানো চাকর রামনিধিয়া তো ভয়ে দোতলায় ওঠে না। কানাই সিং এখনও খুব দুর্বল। ঠাকুর গাঁজাখোর। আমার ভরসা এক রাসমণি ।

দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম বটে, কিস্তৃ রাত্রে ভালো ঘুম হল না।সুশান্তর ঘরে রাসমণি ডাকে কি না। রাসমণি চায় আমি ওর কথা শুনে চলি। আমার বয়সের তুলনায় ও আমার মায়ের বয়সি । তাই বুঝি এত টান আমার ওপরে ? সুশান্তর জ্বর আজ নেই কিন্তু বসন্ত গুলাে শুকিয়ে উঠবার দেরি আছে। ততদিনে মা এসে যাবেন।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি মাথার ঝিমঝিম ভাব আজ মোটে হয়নি। যদিও রাত্রে নানা চিন্তায় ঘুম আসেনি ভালো। বুঝতে পারলাম, ঠান্ডা বাতাসে অমন হত। দরজা খুলে শোওয়া

চলবে না।

রাসমণিকে আজ বড়ো বিষন্ন দেখলাম । দিনরাত একটানা কাজ করে করে বেচারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বোধহয়। সুশান্তর অসুখে কলেজে যাওয়া বন্ধ দিয়েছিলাম। দুপুরে সুশান্তর ঘরে বসলাম ইতিহাসের বইখানা নিয়ে। রাসমণিকে বললাম, “এ কয়েকদিন রাত জেগেছ, একটু ঘুমিয়ে নাওগে।

রাসমণি কেমন করে যেন আমার দিকে চেয়ে চলে গেল ঘরের বাইরে । বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। তীব্র চাউনি রাসমণির, যেন আমার মধ্যে থেকে কিছু তুলে নিতে চায়। কী যে জিনিস? কেন আমার ওকে দেখলে এমন ভয় ...হচ্ছে? ও তো নিরীহ প্রাণী... আমাকে এত ভালাোবাসে । "

দুপুর তিনটের সময় চা খেতে ইচ্ছা হল। নীচে নেমে এলাম । গাঁজাখোর ঠাকুরের দেখা পেলাম না। চাকরের ঘরের দিকে যেতেই দেখলাম খিড়কির দোর দিয়ে রাসমণি প্রায় দৌড়ে এসে উঠোনে ঢুকল। চমকে উঠলাম ওর দিকে চেয়ে । হাতে মুখে কাপড়ে রাসমণির তাজা রক্তের ছোপ, চুলগুলো এলানো। হঠাৎ দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। আমি থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম, রাসমণিও আমার দিকে চেয়ে ঘাবড়ে গেল। একটু পরেই সামলে নিয়ে রাসমণি তার পরিচিত মায়া জড়ানো গলায় বলল, “দ্যাখেন দিদিমণি, পাড়ার লোকে আমারে তাড়া দিল । দৌড়ায়ে প্যালাতে যায় ক্যাটাকুট্যা গ্যালাম পইড়া যায়া। কেমন ধারা লোক এ্যারা গো ?’ ’

আমি বিগলিত হয়ে পড়লাম । আহা আমাদের জন্য রাসমণির এত শাস্তি। বললাম, “দেখি, দেখি কোথায় কাটল ? ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি ।”

রাসমণি চট করে সরে গেল। বললে, “ও কিচ্ছু না, দিদিমণি। গরিবের অমন কত লাগে।’ ‘

রাত্রে সেদিন স্বপ্ন দেখলাম, ঘোর বনের মধ্যে পথ হারিয়েছি। রাসমণি নীল আলোর মধ্যে আসছে আমার দিকে পায়ে পায়ে... হেলেদুলে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে। কিন্তু রাসমণিকে দেখে আমার ভয়ই হচ্ছে..... ভরসা পাচ্ছি না। কেমন যেন গা দুলিয়ে চলে রাসমণি, প্রথম দিনেই চোখে পড়েছিল। স্বপ্নের ঘোরে নীল আলোর মধ্যে রাসমণির চলা যেন কত চেনা । কোথায় যেন এমন গা দুলিয়ে চলা দেখেছি ? ঘুমের মধ্যে শিউরে উঠলাম। চিড়িয়াখানার খাঁচায় এমন চলন দেখেছি হিংস্র রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ।

ঘুম ভেঙে উঠে মনে হল কে যেন আস্তে আমার দরজায় ঠেলা দিচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখছে আমার দরজা খোলা কি না। বন্ধ দোর দেখে চুপিচুপি সে ফিরে যাচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট তার নিশ্বাসের শব্দ, পা ফেলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

আমার সাহস ছিল। কাউকে কিছু বললাম না। ছোটো ভাই বোন চাকরবাকর ভয় পাবে ভেবে। কেবল মায়ের আসবার দিন গুনতে লাগলাম। এর মধ্যে সুশান্ত অনেকটা সেরে উঠল, কানাই সিং সেরে উঠে ওর ঘরে শুতে লাগল। রাসমণি বার হয়ে গেল । এ ধারে পর পর কয়েকদিন দরজা ঠেলা, পায়ের আওয়াজ হতে আমার যেন কেমন ভয় হতে লাগল । রামনিধিয়ার পরামর্শে রাসমণিকেই ঘরে শোয়ানো স্থির করলাম । রাসমণি অত্যন্ত খুশি হল।' এইবার আমার সম্পূর্ণ হেফাজত পেল ভেবে বোধহয়।

দু একদিন রাসমণি শোবার পরে একদিন কানাই সিং আমাকে চুপিচুপি ডেকে বলল, “দিদিমণি, উ ঝি তো বাউড়া আছে ।”

আমি বললাম, “একদিন ওকে চোর বলেছিলে, আবার পাগল বলছ? তুমি ওকে দেখতে পার না। ”

“না, দিদিমণি । উ তো কাল দুপহরে উর পরের ভেতর নাচ করছিল একা একা। ”

“নাচ করছিল কী ?"

“হ্যা, দিদিমণি । একা একা লাফাচ্ছিল, আর কী সোব বুলি বলছিল। হামি নিজে দেখেছি।”

আমি কানাই সিং এর কথা হেসে উড়িয়ে দিলাম। রাসমণি আমাকে কত যত্ন করে, ওর বিরুদ্ধে কোনো কথা আমার শোনা উচিত নয়। কত আগ্রহ করে আমার ঘরে রোজ শুতে আসে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আগে আমাকে ঘুম পাড়ায় । ঘুম কী গভীর হয় আমার আজকাল, সারারাত অজ্ঞানের মতো পড়ে থাকি, শরীর যেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার, গরমে আর অসুখের ভাবনায়, তাতে এ ঘুম আমার দরকার ছিল। রাসমণি কত যত্ন করে ঘুম পাড়ায়। মনে মনে কৃতজ্ঞ হলাম । রাসমণি আমার ঘরে শোওয়ায় কোনো ভয় নেই আমার।

তারপরে সিনেমার মতো একের পর এক ছবি আজ আমার মনে ভাসছে ।

শরীরে বল পাই না l রাসমণির দেওয়া দুধ বাটি বাটি খাওয়াতেও শরীর ফেরে না। নিশ্চেষ্টভাবে দিন কাটাই। একদিন ঘুমের ঘোর কেন জানি না, হঠাৎ রাত্রে কেটে গেল। অন্ধকার ঘরে ঘুম জড়ানো চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হল রাসমণি যেন খাটের নীচে পাতা ওর বিছানায় নেই। ও যেন আমার পায়ের কাছে খাটে এসে বসেছে দোজানু হয়ে। দু হাত ওর হাটুতে রাখা, চোখ আধবাোজা । চোঙের মতো মুখখানা আরও সরু হয়ে গেছে যেন, কিছু চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। আমার সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে আছে ভয়ে l আমি যেন আঘাতে নেই। আমার শরীরের মধ্যে থেকে কী যেন উঠে যাচ্ছে রাসমণির দিকে। রাসমণির চোঙের মতো মূখখানা আমার দিকে নামিয়ে আনছে ক্রমশ । চিৎকার করে উঠতে যেয়ে আবার কীসের ঘোরে হারিয়ে ফেললাম নিজের চৈতন্য ।

সকালবেলা উঠে দেখি শরীর আরও খারাপ হয়েছে। মনে কেমন অস্বস্তি। পুজোর ঘরে

যেয়ে ঠাকুরকে ডাকলাম, “ঠাকুর, রাসমণি আমাকে এত ভালোবাসে, ওর সম্বন্ধে আমার মনে কোনো অস্বস্তি আসে না যেন। ঠাকুর, আমাকে রক্ষা করো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না , কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে আমার।''

ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনলেন নিশ্চয়। দুপুরের গাড়িতে সরকারমশাই এলেন। সবাই ভালো হয়ে গেছেন । দু চার দিনের মধ্যে মা বাবা এসে যাবেন। আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম । সরকারমশাই আমাদের মাথা, অমন বিচক্ষণ লোক দেখা যায় না।

সরকারমশাই আমাকে দেখে আকাশ থেকে পড়লেন, “এ কী রুবি মা, এ কী চেহারা হয়েছে! তোমার কি অসুখ করেছিল?”

আমি অবাক হয়ে বললাম, “না সরকারমশাই, বোধহয় সুশান্তর অসুখে আর ভাবনায় এমন হয়েছে । শরীর আমার খারাপ হলেও অসুখ তো নেই।”

সরকারমশাই মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, “রাখো কথা। যার অসুখ হল, সে সুশান্ত তোমার চেয়ে মোটা। এমন মোটাসোটা মেয়ে ছিলে তুমি। কেমন হয়ে গেছ। পাকাটির মতো রোগা ফ্যাকাশে.... শরীরে একটুও রক্ত নেই যেন। কিছু দেখে ভয় পেয়ছ নাকি ?"

“আগে সুশান্তর অসুখের সময় ভয় পেতাম । এখন ঘরে রাসমণি শোয়ার পরে আর ভয় নেই ।" হঠাৎ গত রাত্রির আধো স্বপ্ন আধো জাগরগে দেখা কাহিনী মনে পড়ায় চুপ করে গেলাম।

“রাসমণি শোয়? আচ্ছা ।” সরকার মশাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে জেরা করায় আমি শেষমেষ তাকে সব বলে ফেললাম। শূনে ওর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। উনি একটি ছুতো নিয়ে রাসমণিকে ডাকলেন, “এই যে রাসমণি, তোমাকে যাবার আগে তো ভালো করে

দেখিনি, তাই ডাকলাম । রুবি মা, তোমার কথা চিঠিতে মাকে লিখেছে ।”

রাসমণি যেন চমকে উঠল, “কী কথা ?” সরকারমশাই একদৃষ্টে রাসমণিকে দেখছিলেন, হালকা গলায় বললেন, “তোমার গুণের কথা, তুমি রুবি মাকে কত যত্ন করো তাই । মা শুনে খুব খুশি হয়েছেন, ফিরে এসে তোমাকে পুরস্কার দেবেন ।”

রাসমণি চোখ নামিয়ে মিহি গলায় বলল, “না সরকারবাবু, পুরস্কার ক্যান? আমার কাম আমি করছি। পুরস্কার ল্যাগবো না।”

রাসমণি চলে গেলে সরকাবমশাইকে বললাম, “দেখলেন তো কী ভালোমানুষ?” সরকারমশাই যে কথায় কান দিলেন না। শুধু বললেন, “যা দেখবার দেখেছি ঠিক। রুবি মা একটু সাবধানে থাকো। আমি এক্ষুনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনছি। রাসমণিকে বোলো না কিন্তু। ”

আমি অবাক হয়ে যেতে যেতে শুনলাম, সরকারমশাই পায়চারি করছেন আর নিজের মনে বলছেন, “এক ঘরে দুজন। একজন রোগা কাঠি, অন্যে মোটা খালি। কেন, কেন ?”

তারপরের অধ্যায় ভয়ানক। এক বীভৎস গল্প প্রকাশ পেল। আমার ভাগ্য ভালো তাই রাসমণির অন্য শিকারের অবস্থা হবার আগেই সরকারমশাই আমাকে রক্ষা করলেন। সে এক হইচই কাণ্ড । ডাক্তার, পুলিশ, মনস্তাত্তিক, রিপোর্টার বাড়িতে জমা হল। আমার ছবি উঠল কাগজে রাসমণির কাহিনীর সঙ্গে। মা বাবা দেশ থেকে ছুটে এলেন । রামনিধিয়া ভালো করে রাসমণিকে না চিনে আনার জন্য মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করল । সমস্ত গল্পটা শোনো তোমরা, যা শুনে কলকাতার লোক শিউরে উঠেছিল।

সরকারমশাই বিকালবেলা তিন চারটে লোক নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। আমার শরীর আজ খুব

খারাপ লাগছিল বলে চুপ করে ঘরে শূয়েছিলাম । রাসমণি মেঝেতে বসে আমার জন্য ফল কাটছিল। লোক দেখে উঠে দাঁড়াল । সরকারমশাই বললেন, “রাসমনি, তুমি এখানেই থাকো। রুবি মাকে ডাক্তারবাবু দেখতে এসেছেন।" রাসমনি একপাশে রইল ঘোমটায় মুখ ঢেকে লাজুক ভাবে ।

ডাক্তারবাবূ ও সকলে একবার চোখ পাকিয়ে ওকে দেখে নিলেন। জানি না সরকারমশাই কী বলেছেন । তারপর ডাক্তারবাবু আমাকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন । হাত, গলা, পিঠের চামড়ার কি সব খুঁজে দেখলেন । তারপর হঠাৎ কোণের দিকে যেয়ে রাসমণির হাত চেপে ধরে সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, “কতটা রক্ত খেয়েছ সত্যি বলো তো?”

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাসমণির গলা থেকে একটা বিকট আওয়াজ বার হল। মানুষের গলার এমন আওয়াজ কেউ কখনো শোনেনি। আমরা চমকে উঠে তাকালাম। রাসমণির মাথার কাপড় খুলে গেছে... চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে । চোঙার মতো মুখের লাল টকটকে ঠোট দুটো ফাঁক হয়ে এক সারি ধারালো দাঁত দেখা দিয়েছে । দাঁতের ওপর লাল লাল ছোপ । এতদিন লক্ষ করিনি। দাঁত কড়মড় করে রাসমনি হাত টানছে । চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হচ্ছে ওর। এক মিনিটের মধ্যে লাজুক পাড়াগাঁয়ে ঝি কী ভয়ানক মূর্তি ধরল! রাসমণির নূতন মূর্তি দেখে আমার পেটের পিলে চমকে উঠল। সকলে চেচিয়ে উঠলেন, “ভ্যাম্পায়ার, ভ্যাম্পায়ার ওম্যান।” অর্থাৎ রক্তচোষা স্ত্রীলোক !

রাসমনি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই আর একজন লোক ওকে চেপে ধরলেন। “কোথায় পালাবে, বাছা? সমস্ত কাহিনী শোনাও তো আগে।”

পুলিশের লোক দরজার কাছে পিস্তল উচিয়ে দাড়ালেন, “আজ রাসমনি আর পালাতে হচ্ছে না তোমায় । তোমার নামে হূলিয়া আছে । আর-এক বাড়ির ছেলেকে খেয়ে পালিয়েছ!”

সরকারমশাই বললেন, “চেহারা দেখেই চিনেছি আমি রক্তচাোষাকে। আমাদের দেশে আমার ছেলেবেলায় এমনি একজন ধরা পড়েছিল । তাকে হাজতে রাখা হয়। আমরা যেতাম দেখতে, তাই একে দেখেই চিনেছি । বহাল হবার সময় যদি দেখতাম ভালো করে। আহা তাহলে আমার রুবি মায়ের এমন দশা হত না আজ। ওকে এখন সারিয়ে তূলুন ।"

কানাই সিং লাঠি উঁচিয়ে এল, “এক ঘায়ে মাথা তোর ভাঙি দিব হামি ।” রামনিধিয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, “ম কী জানল গোটা এমনকী হইছে!”

রাসমণির ইতিহাস শুনে আমরা শিউরে উঠলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম ওর হাত থেকে বাঁচার জন্যে। রাসমণির রোমহর্ষক কাহিনী বলছি :

রাসমনি হচ্ছে অস্বাভাবিক মানুষ। ওর নাম দেওয়া চলে ভ্যাম্পায়ার বা রক্তচোষা । তাজা মানুষের বা জন্তুর গায়ের রক্ত চুষে খাওয়াই ওদের লোভ। তাই রাসমণির মুখখানা চোঙের মতো, ঠোট দুটো মানুষের রক্ত খেয়ে লাল টকটকে, দাঁতেও রক্তের ছোপ। রক্তের দাগ তো সহজে ওঠে না। এক এক বাড়িতে নানা মিথ্যা কথা বলে ও ঢুকত । বাড়ির মোটাসোটা ছেলেমেয়েকে আদর যত্নে বশ করত, কাজকর্মে বাড়ির লোকের মন ভোলাত।

তারপরে সুযোগ মতো জ্যান্ত মানুষের রক্ত একটু একটু করে খেয়ে যেত দিনে দিনে।কারণ, ওই তার আহার, অন্য কিছু রুচত না ওর। ছোটো ছেলেমেয়ের ওপরই লোভ ছিল বেশি। রাত্রে ও শিকারের কাছে শোবার ফন্দি খুঁজত, যাতে ঘুমের ঘোরে রক্ত চুষে খেতে পারে। তাই আমি দরজা খুলে যাতে শুই সেই দিকে ওর চোখ ছিল। দু দিন প্রথম লোভ পেয়ে আমার এত রক্ত খেয়ে ফেলেছিল, যে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল । তারপরে আমি দরজা বন্ধ করে শুলে লোভের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুপুররেলা কার যেন রক্ত খেয়ে এসেছিল। আছড়ে পড়ে হাত পা কাটেনি ওর। আমার ঘরে শুতে পেয়ে ওর এত আনন্দ হয়েছিল, যে ও নিজের ঘরে আনন্দে নাচছিল। কানাই সিং দেখে ফেলেছিল। আমার বন্ধ

দরজা রাসমণিই রাত্রে ঠেলত, ওরই পায়ের শব্দ আমি শুনতাম, আমার ঘরে শুয়ে একটু একটু করে আমারই রক্ত ও চুষে নিত। ফলে দিন দিন আমি এমন দুর্বল রক্তহীন হয়ে যাচ্ছিলাম, ও হচ্ছিল আমার রক্তে ফুলেফেঁপে মোটা। । হাত বুলিয়ে মাথায় কী জাদুর ঘোরে আমাকে অচেতন করে রাখত, রাত্রে ঘুম ভাঙত না আমার। গত রাত্রে যা দেখেছিলাম সে স্বপ্নের ঘোর নয়, রাসমণি ওইভাবে আমার রক্ত খেত এধারে আমাকে যত্ন করে... ঘন দুধ খাইয়ে মোটা তাজা করে তুলেছিল, যাতে বেশি রক্ত পায়। মানুষ তো বলির পশুকে এমনি করেই খাওয়ায়। অনেকদিন থেকেই ওর আমার দিকে চোখ ছিল। আমি চিরকাল মোটাসোটা ছিলাম কিনা। বোকা রামনিধিয়াকে পান জরদা খাইয়ে বশে রেখেছিল। সুযোগমতো আমার সর্বনাশ করতে ঢুকে পড়ল কাজে। আমাদের বাড়িতে।

কী ঘৃণিত এই রক্তচোষা। মায়ের জাত হয়ে কিনা অসহায় ছেলেমেয়ের রক্ত চুষে খাওয়া ! তাই কোথাও টিকে থাকতে পারত না ও। যার ওপরে চোখ দিত, তাকে অসম্ভব যত্ন করলেও, সে শুকিয়ে উঠছে দেখে ওকে দূর করে দিতেন মনিব 'ডাইনির নজর' লেগেছে ভেবে। অনেক জায়গায় ধরা পড়ার ভয়ে ও নিজেই পালিয়ে আসত। কত বাড়িতে ওর কবলে ছেলেমেয়েরা 'পার্নিশাস অ্যানিমিয়া' তে মারা গেছে কেউ টের পায়নি।

মানুষ না পেলে জীবজন্তুর ঘাড়ে চাপত ও। অবলা পশু, কিছু বলতে বোঝাতে পারত না। এর আগের মনিবের আদরের কুকুরটি ওর রক্তচোষায় প্রাণ দিয়েছে। আমাদের বাড়িতে আহার গোড়ায় ও পায়নি. তাই সেদিন রাত্রে মরা কুকুরের রক্ত চুষতে গিয়েছিল। যেটুকু ও বাকি রেখেছিল, বোকা কানাই সিং কথা বলে না ফেললে, ওর স্বরূপ সেদিন রাত্রেই প্রকাশ পেত । কানাই সিং ঠিক দেখত ও কুকুরের ঘাড়ে দাঁত বসাচ্ছে। মনে পড়ল আমাদের পোষা বেড়ালটার রাসমণিকে দেখে কী ভয়, কী পালানো। ওকে দেখলেই 'ম্যাও ম্যাও ' ডেকে বেড়ালটা কেঁদে উঠে পালিয়ে যেত। দু-একদিন হয়তো শখ করে রাসমণি ওরও রক্ত চেখে দেখেছে ।

রাসমণির আচার ব্যবহারের অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার অদ্ভুত চলন আর চাউনি, আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটা, কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হত। সম্পূর্ণ গিলে খেতে পারেনি আমাকে, তাই কই মাছের মতো জিইয়ে রেখেছিল একটু একটু করে খাবার আশায়।

ডাক্তারবাবূ দেখলেন আমার হাতে, গলায়, পিঠে, বুকে ছোটো ছোটো ক্ষতের দাগ। আমি লক্ষ করে দেখিনি। বড়োগোছের সূচ বেঁধানোর মতো । ডাক্তারবাবু বললেন , "এইসব জায়গার দাঁত দিয়ে ছোটো ছোটো গর্ত করে রক্ত চুষে নিত। বড়ো গর্ত করত না ধরা পড়বে বলে।"

আমার হতে পা কাঁপতে লাগল, রাসমণির দিকে চেয়ে ঘৃণার সঙ্গে বললাম , ' 'হতভাগি রক্তচোষা। আমি না তোমাকে বিশ্বাস করতাম ? এইজন্য তুমি আমাকে যত্ন করতে, খাওয়াতে ? "

রাসমণি ফিরে দাঁড়াল। চুল এলিয়ে গেছে ওর। লাল টকটকে ঠোটে দাঁতে বিকট হাসি হেসে নিজের বুকে কিল মারতে মারতে বলতে লাগল, "তোকে আমি খাইয়েছি কেন জানিস ? নিজে খাব বলে, নিজে খাব বলে, নিজে খাব বলে।"

রাসমণির চেহারা দেখে ভয়ে আমি মূর্ছার মতো হয়ে পড়লাম। ডাক্তারবাবু তাই দেখে ওকে ছেড়ে দৌড়ে এসে আমাকে ধরলেন। এমনি তাজ্জব কাণ্ড....অন্য লোকটির হাতে হঠাৎ রাসমণি মুখ নিচু করে প্রকাণ্ড কামড় বসাল ! যন্ত্রণায় তিনি হাত ছেড়ে দিতেই হতভম্ব কানাইকে এক ধাক্কায় সরিয়ে রাসমণি এক লাফে বাইরে ছুটে পালাল, তার হাসির শব্দে বাড়ি কাঁপতে লাগল ।

'ধর ধর' করে সকলে ছুটলেন। রাসমণি তখন পগার পার। এক লাফে প্রাচীরের গায়ে

পেয়ারা গাছে চড়ে বসল । পুলিশের লোক গুলি ছুড়ল, কিন্তু গাছ থেকে কতকগুলো পেয়ারা পাতা শুধু খসে পড়ল ঝরঝর করে, রাসমণিকে কেউ খুঁজে পেল না। আজও তার সন্ধান মেলেনি ! তারপর ও বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে গেলাম। রাসমণির জিনিসপত্র সব পুলিশে নিয়ে গেল।

রাসমণির কাহিনী শূনলে তো? আমার কিন্তু ভয় হয়, কোনদিন সে না তোমাদের ঘাড়ে চাপে। অজানা ঝিকে চট করে বাড়িতে রেখো না কেউ। বিশেষ করে চোঙার মতো মুখ আর লাল টকটকে ঠোঁট দেখলে তাকে তক্ষুনি ধরিয়ে দিও।

আমার তোমাদের জন্য বড়ো ভয় হয়, রাসমণি এখনও ধরা পড়েনি কিন্তু।

(সমাপ্ত)